তীর্থ—কলঙ্ক ভঞ্জন।

OR

"The war of belief against unbelief."

দেবে তীর্থে দ্বিজে মন্ত্রে দৈবজ্ঞে ভেষজে গুরৌ।
যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী ॥

BY

PANDIT K. P. MUKERJI.

LATE TEACHER OF LANGUAGES, DOVETON COLLEGE AND ROBERT'S COLLEGE, CALCUTTA.

AUTHOR OF

"What is God and how to know him,"

কলিকাতা।

বি, কে, দাস এবং কোম্পানীর যন্ত্রে

শ্রীঅমৃত লাল ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত, ১৭ নং শ্রীনাথ দাসের লেন,

বহুবাজার।

Price 4 annas.

উপক্রমণিকা।

তীর্থ সম্বন্ধে আজ এই ভারতে বড়ই একটা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ শ্রীশ্রী৺ তারকেশ্বরের মোহান্ত মহারাজ মাধব চন্দ্র গিরিকে লইয়া বর্ত্তমান অন্দোলন চলিতেছে। প্রায় প্রত্যেক বাঙ্গালা কাগজে তাঁহার সাপক্ষে না হয় বিপক্ষে একটা না একটা আছেই। কিন্তু বর্ত্তমান আন্দোলনের বিশেষ কোন মূল পাওয়া যায় না।

"বঙ্গবাসী" কাগজ তো মোহান্ত মহারাজকে যা তা বলিতেছে, তাহার মুখের আঁট নাই। কিন্তু আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি, ইহাতে ঐ মহাত্মার কোন অধ্যাত্মিক অবনতি বা ক্ষতি সম্ভব নহে।

সাঁচ্চা কহে ত মারে লাঠা, ঝুটা জগৎ ভুলাই।
গোরস গলি গলি ফিরে,
সুরা বৈঠল বিকায়॥
চোরকো ছোড়ে, সাধকো বাঁধে।

পথিক কো লাগাওয়ে ফাঁসি।

ধন্য কলিযুগ তেরি তামাসা।

দুঃখ লাগে আর হাঁসি॥

প্রথমতঃ "বঙ্গবাসী"কে অনেকেই বিশ্বাস করিয়াছিলেন কিন্তু ক্রমে তিনি বাড়াবাড়ি করিতেছেন বলিয়া বুদ্ধিমান লোক মাত্রেরই ঐ পত্রিকার উপর অতিশয় অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। বঙ্গবাসীর দেখাদেখি প্রায় সমস্ত বাঙ্গালা কাগজেই, এক্‌বার এক সুর ধরিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের বিরুদ্ধে কাগজে দুই চারিটী প্রতিবাদ পত্র বাহির হওয়ায়, সম্পাদক মহাশয়গণের সুরের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বিশেষতঃ "নিরপেক্ষ অনুসন্ধান' নামে একখানি যথার্থ ঘটনা সম্বলিত ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশিত হওয়ায়, সাধারণে এই আন্দোলনের প্রকৃত কারণ ও বিবরণ অবগত হইয়াছেন। এই পুস্তিকা হইতে সমাজের সুফল ব্যতীত কুফল ফলে নাই।

সম্পাদকগণ এক্ষণে আবার এই বাদানুবাদের নূতন কারণ ও উৎপত্তি স্থান ছাড়িয়া, পুরাতন কাহিনী

লইয়া পড়িয়াছেন। কারণ নূতনে আর বড় পশার বাহোবা ও সুবিধা পাইলেন না।

এক্ষণে সভ্য জগৎ, কাজে কাজেই সভ্যতার নিয়মানুসারে চলিতে হইবে। সেই কারণে ইংরাজী দুই এক খানা কাগজও ওঁদের দেখাদেখি পাঁচালী আরম্ভ করিলেন।

ধর্ম্ম সমাজের এই প্রকার দুরাবস্থা ও কুচ্ছা দর্শন করিয়া, হৃদয় বড়ই ব্যথিত হইল। শান্তির অভিপ্রায়ে প্রথমতঃ "সোমপ্রকাশ" পত্রিকায় একখানি পত্র প্রেরণ করি তৎপরে ঐ বিষয় লইয়া "ইণ্ডিয়ান মিরর" প্রতি-বাদ করেন, তাঁহার প্রতিবাদে যে কোন অন্যায় দোষ ছিল তা নয়। কিন্তু আমি যথাসাধ্য তাহার যুক্তিমত উত্তর দিলাম তবুও, সমাজ তরঙ্গ থাকিয়া থাকিয়া উত্থিত হইতে লাগিল, দেখিলাম বড়ই বিপদ উপস্থিত। তবে একটা মঙ্গলের মধ্যে এই চিহ্ন দেখা যাইতেছে, যে মাঝে মাঝে এখানে সেখানে, তীর্থ সম্বন্ধে সভা ও উপদেশ আরম্ভ হইয়াছে।

কিন্তু এ পর্য্যন্ত ঐ উপদেশের যে মহৎ উদ্দেশ্য,

কার্য্যে পরিণত হয় নাই এবং বোধ হয় শীঘ্র হইতেছে না। কারণ এ রাজসীক সমাজে ও রাজসীক অবস্থায় যে সত্বর সাত্বিক ভাবের উদয় হইবে এমত সম্ভব নহে। যখন সমাজ একটা বিষয় লইয়া, দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত এক দিকে একবারে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে ও উন্মত্ত প্রায়, তখন তাহার নিবারণ জন্য সময় অপেক্ষা করে। কারণ যেখানে যেমন সেখানে তেমন করাই কর্ত্তব্য। বিষয়টা বাদানুবাদ, অতএব অশুভ, ইহাতে কালহরণ করাই বিধেয়।

এক্ষণে আমি "তীর্থ কলঙ্ক ভঞ্জন" নাম দিয়া এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করিলাম; আশা করি ইহা দ্বারা তীর্থ কালিমা, কেলেঙ্কারি কিংকলঙ্ক সব তিরোহিত হইবে। মনুষ্য হৃদয়ে বিশ্বাস ও ভক্তির হ্রাস হওয়াতেই এই সমস্ত কলঙ্ক অবাধে স্রোতের ন্যায় বহন হইতেছে, এবং গভীর চিন্তা হইতে বঞ্চিত হওয়াতেই ইহার এত পরাক্রম।

অধিকন্তু সর্ব্ব সাধারণের অন্তঃকরণে আমার অভিপ্রায় ওউদ্দেশ্য সুন্দররূপে অঙ্কিত ও চিত্রিত

করিবার জন্য, উপরোক্ত দুইখানি পত্রও এই পুস্তকের শেষভাগে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

আর অধুনাতন নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মান বায়ুর অত্যান্তিক হ্রাস বিবেচনায় অতি দুঃখীত অন্তকরণে "সম্মানের আবশ্যকতা" (The importance of reverence) বিষয়ে, ইংরাজী ভাষায় একটি প্রবন্ধ রচনা করিয়া দিলাম।

এক্ষণে এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি সাধারণ শিক্ষিত সমাজে আদরে গৃহিত ও পঠিত হইলেই আমার শ্রম সফল বোধ করিব।

পাঁচড়া,
জেলা বর্দ্ধমান। } পণ্ডিত কালীপদ মুখোপাধ্যায়।

শ্রাবণ, ১২৯৬ সাল।

তীর্থ-কলঙ্ক ভঞ্জন।
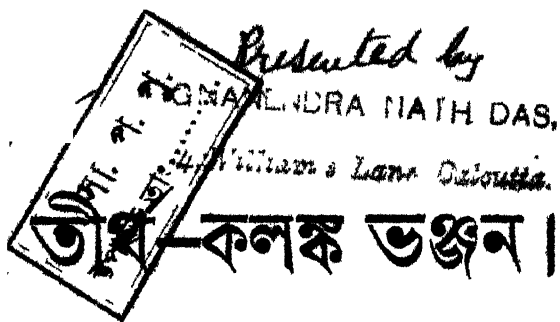
"ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধুঃ"

আজ কাল হিন্দু সমাজে তীর্থ বিষয়ে আন্দোলন, ও তৎসঙ্গে বিবাদ বিষম্বাদ বড়ই প্রখর হইয়া উঠিয়াছে। বিবাদের শান্তি দূরে থাকুক, বরং অধিকতর অশান্তি উত্থিত হইতেছে। এই তো ধর্ম্মের কার্য্য।

তীর্থ অর্থে ঘাট বুঝায়। অতএব ঘাট পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখাই জীব মাত্রেরই কর্ত্তব্য, কিন্তু তাহাতে মনযোগী হওয়া দূরে থাকুক, সকলে মিলিয়া সেই পবিত্র ঘাট প্রায় ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলিবার উৎযোগ করিয়াছেন। ভবিষ্যতে যে আরঘাটে নামিয়া অবগাহন করা যাইবে সে পথও বন্ধ করিতেছেন। এই ত তীর্থ যাত্রিদিগের অবস্থা।

অল্প বুদ্ধিদিগের নিকট সমাজ সংস্কার ও তীর্থ

সংস্ক'রস্বরূপ গুরুতর কার্য্যের ভার উপস্থিত হইয়া; সকলই মূলে বিনষ্যতি হইবার উপক্রম হইয়াছে।

কিয়ৎ দিবস অতীত হইল, কাশীধাম নিবাসী শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব তীর্থ সম্বন্ধে কলিকাতায় এলবার্ট হলে বক্তৃতা করেন তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া আমাদের প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, এবং বুঝিতে পারিয়াছি যে যথার্থ তীর্থ কাহাকে বলে, এবং তাহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ও মর্ম্ম কি।

তীর্থ বা ঘাট সাধারণের জন্য, তাহাতে সাধারণের আবশ্যক। অতএব সাধারণের উপকারের বস্তু লইয়া বিবাদ করা অবিধেয়, তাহাতে নিজের নিজেরই ক্ষতি, অপরের নহে। এ বর্ত্তমান তীর্থ কলহ কি প্রকার যেমন "চোরের উপর রাগ করিয়া ভুঁয়ে ভাত খাওয়া"। অতএব ক্রমানুয়ে বিবাদের ফল এই হইবে যে হয় ঘাটটি ভাঙ্গিয়া ফেলিব না হয় আমাদের অপেক্ষা বলবান, বর্ত্তমান অধুনাতন শাসন কর্ত্তাদিগের হস্তে তুলিয়া দিব। তাহারা মাশুল লইয়া অতঃপর ঘাটে যাইতে দিবেন। এই ত আন্দোলনের ফল।

তোমাদের নিজের ঘাট নিজের আয়ত্তাধিনে থাকিতে, পরের অধীনে যাইতে হইবে। ঘরাও বিবাদের এইত পরিণাম। এত দেখেও যে বাঙ্গালী বাবুরা জাগরিত হন না এই আশ্চর্য্যের বিষয়। আহা দেশের কি ভুরাবস্থা ঘটিয়াছে। ভারত ভুমি, প্রাচীন ধর্ম্ম ও জ্ঞান ক্ষেত্র, এক্ষণে অন্তসার শূন্য হইয়াছে ও হইতেছে। হাঁকরা বাঙ্গালী কেবল অনুকরণ প্রীয়, নিজের সার বিষয় একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে ; পরে যাহা করে তাহাই লয়ে উঠে পড়ে। এত দেখিয়াও তাঁহাদের একটু ও দীর্ঘ-দর্শীতা জন্মিল না। ভবিষ্যতে যে কি হইবে এক বারও তাঁহারা ভাবিয়া দেখিলেন না। প্রবাদ আছে যে লোক ঠেকে শেখে, কিন্তু তাহা আমাদের বাঙ্গালী ভায়াদের হৃদয়ে নাই। এককালে ছিল এখন অন্তর্ধান হইয়াছে। আমাদের সে মনের শক্তি নাই, সে গাম্ভির্য্য নাই, সে একতা নাই, সে সৎভাব নাই—ও অন্যান্য সমস্ত সৎগুণ একেবারেই নির্ব্বাণ হইয়াছে। এখন আমরা কেবল বাজীকরের পুত্তলীকার ন্যায় হইয়াছি।

নিজের অস্তিত্ব একরকম নাই বলিলেই হয়, কারণ যখন পরের দ্বারায় চালিত, তখন নিজের কি ক্ষমতা আছে? যা আছে তা ধার করা। আর এরই এত জাঁক, এবং তাহাতেই মনে করি যে বড়ই সভ্য ও উন্নত হইলাম। কিন্তু পাঠকবর্গ এক্ষণে একাগ্রচিত্ত হইয়া বলুন দেখি, যে এটা গিল্টি করা সভ্যতা কি না? যদি ইহাই হয় তবে আসুন, আমরা আমাদের প্রাচীন ভারতীয় বা আর্য্য সভ্যতা ও প্রণালীর অন্বেষণ করি, এবং সেই অকৃত্রিম সভ্যতার সাহায্যে, নম্র ও বিনীত ভাবে ও মিষ্ট কৌশলে, আমরা আমাদের উদ্দেশ্য তীর্থ বিবাদ ভঞ্জন করি।

কারণ আমরা যখন দেখিতেছি, যে এই প্রকার উনবিংশ শতাব্দীর আইন, পাণ্ডিত্য ও প্রথানুসারে চলিলে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা ও শিক্ষা অনুসরণ করিয়া কাগজে কাগজে বাদানুবাদ করিলে, এই তীর্থ রূপ ঘাট ভাঙ্গা ব্যতিত আর কোন ফল নাই, তখন আমাদের মোটামুটি পুরাতন প্রথাই ভাল, এবং তাহার দ্বারাই কার্য্য করা বিধেয়।

অনেকে বলিতে পারেন যে খোটামুটির ভিতরে থাকিলে, অনেক কষ্ট ও ঝঞ্ঝাট সহ্য করিতে হয়, কিন্তু আমি বলি সরুর ভিতরে কি দোষ নাই ? সভ্যতার পাবে পাবে কি কপটতা ও দুরভিসন্ধি নিহিত নাই ? কে না স্বীকার করিবে ? সকল বিষয়ই স্বাভাবিক, অকৃত্রিম ও সাদা সিদে ভাল ; রঞ্জিত কিছুই ভাল নহে। প্রথম দেখিতে শোভা ও সুন্দর, কিন্তু পরিণামে বড়ই বিষফল প্রদান করে।

তাই বলি যে বিদেশীয় ধার করা সভ্যতার আইন ও প্রণালী অনুসারে তীর্থ সম্বন্ধে কোন বিষয় প্রবেশ করান উচিত নহে। সবই ত গেছে, ধর্ম্মটা আর যায় কেন অর্থাৎ ধর্ম্মের অপমান কেন কর ? অতএব এ প্রকার বুদ্ধির কার্য্য কোন মতেই অনুমোদিত নহে। অতএব হে সমাজ সংস্কারকগণ, যা কর নিজে নিজে গোপনে সমাপন কর। "গোপন" শব্দটি কেন ব্যবহার করিলাম, বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। একে তাকে ডাকিবার আবশ্যক করে না। কারণ নিজের ঘরের বিবাদ নিজে নিজে স্থির ও ক্ষমশীল

হইলেই মিটিয়া যাইবে। এ সকল পবিত্র কার্য্য উদ্ধারের জন্য মান অপমানের ভয় করিলে চলিবে না। সকলে একমত হইয়া যাহা পবিত্র ও শ্রেয়কল্প করিলেই হইবে। এত তাড়াতাড়ী করিয়া কেন একটা বস্তু নষ্ট কর এবং বস্তু বলে বস্তু নয়, আমাদের জীবনের সার বস্তু—ধর্ম্ম।

এই ধর্ম্ম আজ ভারতে কতকগুলা বাঁদরের হাতে পড়িয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। আহা আর্য্যসন্তান গণের কি দুর্দ্দশা। পরাধীন বলিয়া আজ তাহারা নিজের গুঢ় অস্থিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া গেল। হিন্দু সমাজ ও হিন্দু গৌরবকে আজ তাহারা ম্লেচ্ছ সমাজ করিয়া ফেলিয়াছে। নিজের রীতিনীতি প্রথা ও প্রণালী ঠেলিয়া যাবনীক প্রথা অনুসারে কার্য্য করিতেছে। এখন তাহারা পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রভাবে বিবাদ ও বাদানুবাদ বিষয়ে বেশ পটু এবং ইহাতেই মনে করে যে ধর্ম্ম ও সমাজের উন্নতি সাধন হইতেছে। আমাদের সনাতন হিন্দু ধর্ম্ম বাহ্যিক আড়ম্বরের জন্য নহে, কাগজে লড়াই করিবার জন্য ও নহে। আমাদের ধর্ম্ম

হৃদয়ে হৃদয়ে নিহিত, হৃদয়ই বুঝিবে, হৃদয়ই কার্য্য করিবে। ধর্ম্মে কলহ নাই, ধর্ম্মে—শান্তি আছে।

ধার্ম্মিক জীবনের যে কি গুরুতর কার্য্য, তাহা বর্ত্তমান সময়ে একেবারে তিরোহিত প্রায় হইয়াছে; যাহা আছে তাহা নাম মাত্র। ভক্তি ও শ্রদ্ধা আজিকার জগতে নাই বলিলেই হয়, এবং তৎসঙ্গে বিশ্বাসও প্রায় লোপ পাইয়াছে। মনুষ্য কেবল ভূয়ো তর্কে মজবুদ। সার বস্তু নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না,এবং যদিই থাকে, অতি অল্প স্থানে ও অল্প মনুষ্যেই আছে।

ধার্ম্মিক জীবন, ধর্ম্মের জন্য কখনও কাহারও উচ্ছেদ সাধনের চেষ্টা করেন না, বরং ইহার বিপরীত কার্য্যই করিয়া থাকেন, এবং তাহাই বিধেয়। মিষ্ট কথায় যেরূপ কাজ হয়, চোক রাঙ্গানিতে সেরূপ কখনই সম্ভব নহে। কিন্তু আজ সে দিন কোথায়? নাম চাই; পসার চাই। ভক্তি, শ্রদ্ধা, ও আত্মবিসর্জ্জন সংসার হইতে অদৃশ্য প্রায় হইয়াছে। এখন ঘরে ঘরে সভা ও সমাজ সংস্কারক, কথাটি শুনিতে ও বলিতে বড়ই সুন্দর, কিন্তু তা হলে কি হবে, কেবল

মাঝে, কাজে কিছুই নহে, কারণ শত করা নিরনব্বই জন আত্মশ্লাঘা ও অহঙ্কারে পরিপূর্ণ। আরও বিশেষতঃ এত আড়ম্বরে কখন কাজ হয় না, কেবল মিথ্যা আস্ফালন আছে। বিশেষ ধর্ম্মের কাজ, শুদ্ধ কাগজে কলমে ও কথায় সাধিত হইতে পারে না। আভ্যন্তরিক কার্য্য—মনের কার্য্য, প্রেমের কার্য্য, প্রাণের কার্য্য; জাগতিক ও বাহ্যিক বিষয়ের সহিত কখনই তুলনা হইতে পারে না।

অতএব এক্ষণে দেখিতে হইবে, যে যদ্যপি এই ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন বিপ্লব উপস্থিত হইয়া থাকে, তবে তাহা মনে মনে, প্রাণে প্রাণে মিশাইয়া ভক্তি ও প্রেম রূপ উপায় দ্বারা নিবারণ করা কর্ত্তব্য।

আধ্যাত্মিক জগতের নিগূঢ় তত্ত্ব যে কি, তাহা বর্ণনা করা বড়ই দুঃসাধ্য। বিশেষতঃ, আমাদের ন্যায় অল্প বুদ্ধি ব্যক্তির হঠাৎ বুঝিতে যাওয়া ও বুঝাইয়া দেওয়া মূঢ়তা মাত্র। অনেকেই ধর্ম্মকে যেন একটা ছেলে খেলার জিনিষ পাইয়াছে। হাটে, মাঠে, বাজারে ও নানাস্থানে আজ আমাদের হৃদয়ের ধন—ধর্ম্মের ছড়া-

ছড়ি, হায় ! সুধা ও অমৃতের—কি এই দুরাবস্থা। কেন এমন হইল, ভারতে কি পাপের স্রোত বহিতেছে ? না হইলেই বা এমত যন্ত্রনা হইবে কেন।

বিশ্বাস ও ভক্তির অভাবেই, এই ঘোর বিপদে আমাদিগকে ফেলিয়াছে, আমি সর্ব্বপ্রকার বিপদই বলিতেছি, শুদ্ধ ধর্ম্ম বিপদ নহে। আমাদের হিন্দু দেবালয় ও তীর্থ স্থানের এতই চমৎকার মহিমা; যে তাহা পর্য্যালোচনা করিলে ; প্রাণ দিব্য রসে সুশীতল হয়। আমি এক্ষণে এই বিষয়ের একটি প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ মূলক বৃত্তান্ত পাঠকগণকে জ্ঞাপন করিব ; যদিও তাহা অনেকেই জ্ঞাত আছেন।

আমরা শ্রীশ্রী৺ তারকেশ্বর মহাদেব ও উক্ত তীর্থ সম্বন্ধে বাল্যকালাবধি বহুবিধ অত্যাশ্চর্য্য ও অমানুষিক গল্প শ্রবণ করিয়া আসিতেছি। কিন্তু তাহা কতদূর সত্য, এ পর্য্যন্ত বুঝিতে ও জানিতে পারি নাই, কারণ তাহা গল্প বলিয়াই বিশ্বাস ছিল। অদ্য ঈশ্বর কৃপায় উক্ত পবিত্র স্থানে আশ্রিত হওয়ায় এবং সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করায় দেখিলাম, যে কেবল আমাদের

অবিশ্বাস হেতু এই গুঢ় মনোহর বিবরণ জানিতে পারি নাই।

বিশ্বাস—কি চমৎকার সন্তোষদায়িনী। অনেকেই বলিয়া থাকেন যে কোন পদার্থের গুণ না দেখিয়া বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত নহে, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ বিশ্বাসের অন্যতর নাম—প্রেম, সহানুভূতি, ভক্তি ও শ্রদ্ধা। অতএব দেখিতে হইবে যে যদ্যপি আমরা কোন দ্রব্যের গুণ অবগত হইতে ইচ্ছা করি ; প্রথমতঃ প্রেমরূপ বিশ্বাস স্থাপন করিব ; এবং পরে এই ভালবাসা জন্মিলেই, পদার্থের সহিত বন্ধুত্ব হইবে এবং এই ভাবেতেই সকল ভাব বুঝিতে পারা যাইবে। প্রেমের কার্য্যে প্রেমই—উৎপন্ন হয়। এক্ষণে বুঝিলাম, যে বিশ্বাস—একটি পরম রমণীয় যন্ত্র, যাহার সাহায্যে অতি গুঢ় রহস্য নিজ আয়ত্তাধীনে আনিতে পারা যায়।

উক্ত পবিত্র তীর্থ স্থলে প্রতিদিন যে কত শত পীড়িত ব্যক্তি ধন্না দিতেছে তাহা বর্ণনা করা যায় না। ইহার মধ্যে অধিকাংশ লোকই স্ত্রী জাতি, কারণ

তাহাদের বিশ্বাস কিছু অধিকতর ও প্রকৃত। বিশ্বাসের তারতম্য অনুসারে ফলের তারতম্য হইয়া থাকে। দেখা গিয়াছে যে কঠিন ব্যাধিগ্রস্থ ব্যক্তি তারকেশ্বরে ধন্না দিয়া চির রোগ হইতে একেবারে মুক্ত হইয়াছে। এমন কি, বহু সংখ্যক লোক, যাহাদের কোন পীড়া অতি উৎকৃষ্ট চিকিৎসক দ্বারাও নিবারিত হয় নাই, এই দেব দুর্ভ স্থানে আগমন করিয়া, শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। আহা, বিশ্বাসের—কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা। কিন্তু আজ আমাদের এই হতভাগ্য শিক্ষিত ভারতবাসী এই বিশ্বাস প্রেম—হইতে স্খলিত পদ।

এই তীর্থ সম্বন্ধে আরও আমরা অতি বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম, যে অধিকাংশ রোগী ব্যক্তি তিনচারি দিবস হত্যার পর, অতি আশ্চর্য্য রূপে তাহাদের পীড়ার ঔষধ প্রাপ্ত হয়। কখন কখন স্বপ্নে ঔষধের উপায় ও নাম জানিতে পারে।

তারকেশ্বর সংক্রান্ত প্রায় সকল লোকই অতি পরিষ্কার রূপে জ্ঞাত আছেন ও বলেন, যে সচরাচর, রোগীগণ তাহাদের পীড়ার ঔষধ নিজের নিজের হস্তে

ঈশ্বর কৃপায় পাইয়া থাকেন। এটি আমাদের নিকট যত আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহা তারকেশ্বর বাসিগণের কিম্বা ধন্নাদারীদিগের সমক্ষে তত নহে। কারণ এই বিষয় তাঁহাদিগের নিকট অত্যুক্তি বলিয়া বোধ হয়। বস্তুতঃ যে হৃদয়ে বিশ্বাস আছে, সেখানে কোন বিষয়ই অসাধ্য নাই। বিশ্বাসকে—আমরা ইন্দ্রজাল ও গুপ্ত মন্ত্র বলিব।

অধিকন্তু, এই তীর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে আরও আমরা অতি অদ্ভুত অদ্ভুত বিশ্বাসযোগ্য বৃত্তান্ত, বর্ত্তমান মোহান্ত মহারাজ মাধব চন্দ্র গিরির প্রমুখাৎ শুনিলাম। এবং সেই মহাত্মার সহিত আলাপ করিয়া তাঁহার প্রতি আমাদের ভক্তি ব্যতিত, আর কিছুই উদিত হইল না। যদিও তাঁহার অন্তরে অধুনাতন বাহ্যিক আড়ম্বর যুক্ত, "মাকাল ফল সভ্যতা" প্রবেশ করে নাই বটে, (যাহা আজ কাল অনেকেই বলিয়া থাকেন) কিন্তু যাহা আছে, তাহা অতি স্বাভাবিক, সরল ও পবিত্র। তাঁহার গুণের বিষয় যে আমরাই ঘোষনা করিতেছি তাহা নহে, যে যে ব্যক্তি তাঁহার সহিত কথোপকথন

করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বুঝিয়াছেন ও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। যে কোন সৎলোক তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিয়াছেন, তাঁহারা ঐ মহাত্মার গুণানুবাদ ব্যতিরেকে আর কিছুই বলেন না। ইহার কারণ কি? বোধ হয় তাঁহার কিঞ্চিৎ ঐশী শক্তি আছে, যাহার প্রভাবে লোকের মন আকর্ষিত হয় ও মজিয়া যায়। মধু থাকিলেই—মাছি আসিয়া বসে। জীবগণ—জ্যোতিই অন্বেষণ করে। মহাদেবের যে যৎপরোনাস্তি কৃপা তাঁহার প্রতি আছে, আমরা তাহার অনেক প্রমাণ পাইয়াছি এবং তাহা বিশ্বাস করি।

এই তীর্থের মহিমা সম্বন্ধে, আর একটি ব্যক্তিগত সত্য বিবরণ লিখিতে বাধ্য হইলাম; কারণ আজ কাল কার লোকের মন প্রায় অবিশ্বাসেই পরিপূর্ণ, সহজে বিশ্বাসের দিকে ধাবমান হয় না। বিশেষ প্রমাণ দেখিতে চাহে এবং কোন ঘটনা বস্তুত হইয়াছিল, কি না, তাহাও জানিতে ইচ্ছুক। এটা ভাল বটে, কিন্তু তাও বলি, যখন হাজার হাজার লোক

সেই তীর্থ স্থলে উপস্থিত হইয়া অতি কঠিন কঠিন ব্যাধি, যথা যক্ষ্মা, কাশ, শূল, কুষ্ঠ প্রভৃতি অতি উৎকট রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিতেছে, এবং দেশে বিদেশে সাক্ষ্য দিতেছে, তখন আমাদের এ বিষয়ে অবিশ্বাসের কোন বিশেষ কারণ হইতে পারে না। নভেলিশ নামক কোন বিখ্যাত পণ্ডিত বলেনঃ—বিশ্বাস কি একটি ঈশ্বর প্রোক্ত ধন্বন্তরী নহে? যাহা হউক, যে প্রত্যক্ষ বিবরণের বিষয় আমরা নিজে শুনিয়াছি ও জানিয়াছি তাহাই এক্ষণে বলি।

কিছু দিবস হইল, কালীঘাটের হালদারদের বাড়ীর দুইটি স্ত্রীলোক পক্ষাঘাতে একেবারে পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, উক্ত তীর্থ ক্ষেত্রে যাইবার মানস করে। তিন চারি জন লোক তাহাদিগকে ধরাধরি করিয়া গাড়ী ও পাল্কীতে তারকেশ্বরে লইয়া যায়, এবং তাঁহারা সেখানে পৌঁছিয়া, বাবা মহাদেবের মন্দিরে ধন্না দেয়। দ্বিতীয় দিবসে তাহারা শায়িত অবস্থায় নিজ নিজ হস্তে উক্ত ব্যাধির ঔষধ প্রাপ্ত হয়।

পরে দেবতার আদেশমত ঔষধ সেবন করিয়া, রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করে। অর্থাৎ অঙ্গ প্রত্য-ঙ্গের আর অবসান নাই, কাঁপুনী নাই, দেহ পূর্ব্ববৎ হইল। আহা! বিশ্বাস ও দেব মাহাত্মের কি অলৌ-কিক কার্য্য। আর তাহাদিগকে ধরিয়া লইয়া যাইতে হইল না। তাহারা স্বয়ং ঈশ্বর বলে বলিয়ান হইয়া সঞ্চরণ করিতে আরম্ভ করিল।

যে লোক দুই দিন পূর্ব্বে আদৌ চলিতে কি বেড়া-ইতে পারিত না, কেবল শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিত; আজ তাহারা সচ্ছন্দে ও নিরাপদে কাহারও সাহায্য ব্যতিত, মনের আনন্দে ৺ তারকেশ্বর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে করিতে নিজ আলয়ে প্রত্যাগমন করিল। এমন কত দৃষ্টান্ত দেখাইব? প্রতিদিনই এইরূপ ঘটিতেছে।

দুঃখের বিষয় এই যে, ক্রূর ও অবিশ্বাসী মানবগণ ইহা দেখিয়াও দেখিবেন না; তাঁহাদের হৃদয় পাষাণ হইয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, আমাদের দেশের "বঙ্গবাসী" নামক কাগজের ৺

তারকেশ্বর সংক্রান্ত কোন বিষয়েতেই সন্তোষ লাভ হইল না। আমাদের বোধ হয় এই প্রকার নির্লজ্জ ও পাষণ্ড ব্যক্তিদের হৃদয়ে সন্তোষরূপ পদার্থের আকর নাই। নহিলে এমন কেন হইবে ?

আমরা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি, যে প্রতিদিন এখনও শত শত যাত্রী বাবার মন্দিরে ধন্না দিতেছে, এবং দেবে, অতএব তাহারা কি বঙ্গবাসী নহে ? তাহারা কি হিন্দু নহে ? তাহাদের কি বুদ্ধি নাই ? তাহারা কি মনে বোঝে না ? তাহাদের কি কায়দা ও আবরু নাই ?

বড় বড় সভ্রান্ত লোকদিগের স্ত্রী পরিবারাদি সর্ব্বদা ঐ তীর্থ স্থানে যাওয়া আসা করিতেছে। তাঁহাদের কর্ত্তৃপক্ষগণের কি পাপ পুণ্যের ভয় নাই ? না তাঁরা বড় বোকা ? যদি কোন যথার্থই কলঙ্ক কিম্বা অত্যাচারের আশঙ্কা থাকিত, তাহা হইলে, এই তীর্থ ক্ষেত্র আজ অরণ্য ও মরুভূমিতে পরিণত হইত———এক্ষণে এই সকল নীচ প্রবৃত্তির কথা ছাড়িয়া দি, এ প্রকার মনে করিলেও মহা পাপ হয়।

তারকেশ্বর রেল প্রস্তুত হওয়ায় যাত্রীগণের যাওয়া আসার সুবিধা হইয়াছে, এবং এ হুজুগে যাত্রী কমা দূরে থাকুক, বরং উত্তরোত্তর যাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি হই-তেছে। সমস্ত সৎকার্য্যের দ্বারায় দিন দিন তার-কেশ্বরের শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইতেছে। যেন মেঘাবৃত রবি ক্রমশঃ জাজ্জ্বল্যমান হইয়া প্রকাশ হইতেছে এবং আরও হইবে। মোহান্ত মাধব গিরির শত্রু পক্ষিয়েরা, এবং এই তীর্থ সংক্রান্ত সকল বিষয়ই যাঁহাদের "চোকের বিষ" হইয়াছে, তাঁহারা বলিতে পারেন, যে কেনই বা আমরা এই বিষয় লইয়া এত লড়াই করি-তেছি, এবং কেনই বা ইহার হইয়া এত বলিতেছি, তাহার স্পষ্ট প্রমাণও কারণ এই,—পবিত্র কার্য্যে, পারমার্থিক বিষয়ে—প্রগাঢ় ভক্তি ও ধ্রুব বিশ্বাস।

প্রখর জ্যোতি—ও তাহার কিরণ কেহ কখনও নির্ব্বাণ করিতে পারে নাই ও পারিবেক না। অতএব পতঙ্গের দ্বারায় জ্যোতির অবরোধ হইতে পারে না, ইহাতে পতঙ্গেরই ধ্বংস নিশ্চয়। তাহাদের স্বভাব দোষে আলোকের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়ায় মাত্র।

তাহারা যদ্যপি পতঙ্গ অপেক্ষা উন্নত পদে স্থাপিত হইত, তাহা হইলে কেন এরূপ করিয়া বেড়াইত? উন্নত পদের কার্য্যই করিত এবং আরও উন্নত হইত। কিন্তু হায় তাহা কোথায়? এক্ষণে অনেকে মনে করিতেছেন যেন আমরা কাগজওয়ালাদিগকেই বলিতেছি, তাহা নহে, ইহার ভিতরে অনেক প্রভু আছেন। তাঁহারা ভিতরে ভিতরে চুপে চুপে চোরের ন্যায় সৎব্যক্তির দোষই অনুসন্ধান করিয়া বেড়ান, একবার ভুলিয়াও গুণের বিষয় দেখেন না।

সংসারে চোদ্দ আনা অসম্পূর্ণ মনুষ্যের বাস, অতএব তাহাদের কথা ও উপদেশ শুনিয়া কার্য্য করিলে, সংসার নির্ব্বাহ হয় না। এবং তাহাদের কথায় কর্ণপাত কি বিশ্বাস করাও উচিত নহে। তাহাদের স্বভাবই চীৎকার করা। কিন্তু যাহাই হউক, ইহাতে সমাজ-বেড়ই ক্রমশঃ তিক্ত হইতেছে। সম্পূর্ণ মনুষ্যগণ, চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ, ভাবুক লোকগণ এক্ষণে কোথায়? আমাদের ইচ্ছা ও মিনতি এই যে, তাঁহারা আর যেন নিদ্রিত না থাকেন। এ ধর্ম্ম-প্রলয় সময়ে একবার

সকলে জাগরিত হউন। আপনাদের সাহায্য ব্যতি-রেকে এ কলঙ্ক অগ্নি নির্ব্বাণ হইবার সম্ভাবনা নাই।

যাঁহাদের হৃদয়ে বিশ্বাস, ভক্তি, গাম্ভীর্য্য ও দীর্ঘ-দর্শিতা আছে, তাঁহারাই আমাদের এই প্রকৃত উদ্দে-শ্যের মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। বিশ্বাস, ভক্তি ও ক্ষমা গুণেই তীর্থ ও ধর্ম্মের গৌরব রক্ষিত হয়। এবং এই প্রণালীতেই চিরকাল ধর্ম্ম মর্য্যাদা অকলঙ্কিত হইয়া আসিতেছে। অতএব যে তীর্থ-ক্ষেত্র অবলম্বন করিয়া এই বর্ত্তমান আন্দোলন চলিতেছে, যদ্যপি এখানে কোন একটা বিশেষ পাপাগ্নি কিম্বা নীচত্ব প্রবেশ করিত, তাহা হইলে আজ অবধি এই তীর্থ স্থানে পূর্ব্বোল্লিখিত দেবদুর্ল্লভ ও অলৌকিক ক্রিয়া কখনই জাজ্জ্বল্যমান থাকিত না।

তারকেশ্বর তীর্থেই যে কেবল এই সমস্ত অমানুষিক ব্যাপার দর্শন করা যায় এমন নহে; ভারতে যত কিছু তীর্থ স্থান ও দেবালয় আছে, প্রায় অধিকাংশ স্থানেই এই প্রকার অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা

পরিলক্ষিত হয়। এ প্রকার কেন হয়? বিশ্বাস ও তীর্থের মহিমা ব্যতিত আর কিছুই নহে। এই জগতে যে কত কত অদ্ভুত বিষয় অজ্ঞাত ও লুক্কায়িত আছে, তাহা বর্ণনাতীত। কিন্তু এক্ষণে মনুষ্যের হৃদয় ভক্তি হইতে, এতই দূরে পতিত হইয়াছে, যে তাহারা বিশেষ তর্ক ও বাদানুবাদ করিয়াও সন্তোষ লাভ করিতে অক্ষম। মূলে আঘাত করিলে মিথ্যা তর্কে কোন ফলোদয় হয় না। সৎ অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে হই-লেই, অন্তরের—স্বাস্থকর পদার্থ দ্বেষশূন্য বিশ্বাসকে অগ্রে অবলম্বন করিয়া কার্য্যে ব্রতী হইতে হইবে; অন্য শুভাকাঙ্ক্ষী হৃদয়ই,—যথার্থ ও অকৃত্রিম হৃদয় বলিয়া পরিগণিত, এবং এই প্রকার সৎ অন্তকরণ বিশিষ্ট ব্যক্তি দ্বারাই সমাজের ও জনগণের নির্ব্বিরোধে, বিনা ক্ষতিতে ও অকলঙ্কিত ভাবে যথার্থ উপকার ও সংস্কার সাধিত হইতে পারে। গ্লানি, নিন্দা, কুৎসা, ও বিবাদের পথ বড়ই সহজ এবং তাহা সহজেই নিষ্পন্ন হয়, কিন্তু ক্ষমা, প্রশংসা, বিবাদ ভঞ্জন ও শান্তি সহজে সাধিত হয় না এবং

কাজে কাজেই শক্ত। অতএব যাহা কঠিন তাহাই প্রশংসনীয়—ও বিধেয়।

কিন্তু হায়! আজ তাহা কোথায়? কেবল স্বার্থ সাধন ও পরাজিত করিবার কাল পড়িয়াছে। পবিত্র ও নিস্বার্থ আধ্যাত্মিক ভাব জগতে বড়ই বিরল। যৎকিঞ্চিৎ যাহা আছে, তাহা কল্পনা, কথা, ও অক্ষরে।

সমাজ সংস্কার ও সংস্কারক এই দুইটী কথা শুনিতে বড়ই মধুর, কিন্তু তাহাদের মূলে দোষ। অতএব মূলে পাপ থাকিলে, শুদ্ধ বাহ্যিক আড়ম্বরে কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে না।

মালা জপে শালা, কর জপে ভাই।
যো মন্ মন্ জপে ওসকো বলিহারি যাই॥

তারকেশ্বরের বর্ত্তমান মোহান্ত মহারাজের চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের এই হিন্দু সমাজে নানা লোকে নানা প্রকার বলেন এবং বলিতেও পারেন, কারণ তিনি

একবার পূর্ব্বে সাধারণের নিকট দোষী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিলেন। কিন্তু আমরা এপর্য্যন্ত অতি গভীর অনুসন্ধান করিয়াও, তাঁহার উক্ত চরিত্রের অপবাদ ও দোষ সম্বন্ধে বিশেষ কোন মূল কারণ প্রাপ্ত হইলাম না। যা কিছু পাওয়া যায় তাহা অতি গুপ্ত রহস্য ও সন্দেহ মধ্যে স্থাপিত। অতএব আমরা তাহা বাহ্য জগতে হঠাৎ বিশ্বাস করিতে পারি না এবং করাও উচিত নহে। কারণ তাহার কোন প্রত্যক্ষ মূলক প্রমাণ নাই বা পাওয়া যায় না। লোকে বলিতে পারেন তবে কেন তিনি দণ্ডিত হইয়াছিলেন এবং কি কারণেই বা এত লোকে তাঁহাকে অপবাদ দেয়, তাহা বিবেচনা ও দেখিবার বিষয় বটে; কিন্তু আমরা যে পর্য্যন্ত তাঁহার চরিত্র ও স্বভাব পাঠ করিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে তাঁহার চরিত্রে কি আচরণে যে, কোন একটা কলঙ্ক আছে, তাহা বোধ হয় না। অনেক সাধু ও পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন যে তাঁহার চরিত্র অতি নির্ম্মল। অতএব তাঁহাদের বুদ্ধি, বিচার শক্তি কিম্বা জ্ঞান কম কি? বলিতে পারি না।

তবে তাঁহার বিরুদ্ধে, এই সকল অপবাদ রটনা হইবার, তিন চারিটী বিশেষ কারণ আছে। মোহান্ত মহারাজ স্বাভাবিক অতি ভীরু ও বড় সরল, আজ কালকার লোকের ন্যায় চোকল মুখল নহে। সাধারণের প্রতি হঠাৎ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া নিজে কষ্ট পান। কারণ তিনি যে পথে যান, জগৎ তাহার বিপরীত। তিনি সরলতার সহিত বিশ্বাস স্থাপন করেন কিন্তু জগৎ সুবিধা পাইয়া বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য করে। তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে নানা প্রকার গল্প শুনা গেল, কিন্তু কোনটারই ইয়ত্তা করিতে পারা যায় না। তবে শেষে আমরা এই ঠিক করিলাম যে, তাঁহার অনুচরবর্গের মধ্যে কতক বদমাইশ লোক আছে, তাহারা নিজে দোষ করিয়া, তাঁহার ঘাড়ে ফেলিয়া দেয়। যেমন "দশ চক্রে ভগবান ভূত" তিনিও এই প্রকার কুচক্রে পতিত।

এই নিম্নলিখিত শ্লোকের পাঁচটী গুণই তাঁহাতে বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়, কেবল সজ্জ গুণের একটু কম আছে মাত্র—

তুলসী ইয়ে সংসার মে,
পাঁচো রতন হেয়্ সার্।
সাধুসঙ্গ, হরিকথা,
দয়া, দীন, উপকার ॥

"সৎ সঙ্গে কাশীবাস, অসৎ সঙ্গে সর্ব্বনাশ" কেবল এই অসৎ সঙ্গ দোষ তাঁহাতে একটু ঘটিয়াছে। কারণ তাঁহার কোন কোন লোক অশিক্ষিত, নীচাশয় ও অসৎ চরিত্রের লোক, আমরা অনুসন্ধানে উত্তমরূপে জানিয়াছি। এবং মোহান্ত নিজে বড় ক্ষমশীল ও উদার চরিত্রের লোক বলিয়াই তাহাদের এ পর্য্যন্ত জীবিকাচ্ছেদ করেন নাই।

ফলতঃ তিনি নিজে অতি শান্ত, নম্র, জ্ঞানী ও ধীর প্রকৃতির লোক, কেবল "পাঁচ ভূতে" তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। তবে অনেকে বলিতে পারেন যে, যে জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান, তাহার নিকট "ভুত প্রেত" থাকা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে; তিনি ইচ্ছা করিলেই এই সকল পিশাচগণকে দূর করিতে পারেন। এ কথা যথার্থ, তবে একটা কথা এই যে,

তিনি মহাদেবের সেবক ও চেলা, এমন কি প্রতিনিধি-স্বরূপ (যাহা অনেকেই বলিয়া থাকেন) অতএব ভূতনাথের সহিত যে নন্দী ফিরিঙ্গি, ভুত প্রেত, থাকিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? বস্তুতঃ, তাহারা তাঁহার সঙ্গে থাকে বলিয়াই যে, তিনি দোষী ও অ-পবিত্র, তাহা কথনই নহে। কারণ "তিনি" তাহাদের সঙ্গে থাকেন না—তিনি বিভিন্ন। তবে ভুত প্রেতগণ তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না এবং কাজে কাজেই তিনি শিব-স্বভাব বশতঃ তাহাদিগকে তাড়াইয়াও দেন না। কারণ তাহাতে তাঁহার অপযশ আছে, ঐশ্বরীক ও শৈব নিয়ম—লঙ্ঘন। মজাটুকু এই যে, তাহাদিগকে কাছে রাখিলে যশ নাই, দূর করিলে অপযশ। বিশেষতঃ শিবের চেলা হইলেই এই প্রকার ঘটে।

অতএব এঁ প্রকার বিভিন্ন স্বভাব ও গুণবিশিষ্ট জীবের সাংসারিক লোকের নিকট যশ বা সুখ্যাতি কোথায় ? তবে কি তিনি সংসার ছাড়া ? না, তা নয়। সংসার ছাড়া কেহই নহে। কিন্তু এখানে "সংসার ও

সাংসারিক" শব্দের পৃথক অর্থ। যাঁহারা কেবল জাগতীক ও বাহ্যিক ব্যাপার লইয়া থাকেন, ভাবেন ও বিচার করেন, তাঁহাদিগকেই সাংসারিক বলিব। অতএব এই প্রকার সাংসারিক—অর্থে ও ভাবে তিনি নাই, ইহার আধ্যাত্মিক ও আভ্যন্তরিক অর্থে তিনি আছেন। তাঁহার দোষ গুণের বিচার, সমভাবাপন্ন জীবগণের দ্বারাই হওয়া উচিত এবং তাহা হইয়াওছে। এবং ইহার নিষ্পত্তি "তিনি" নির্দ্দোষী।

পারমার্থিক ও জাগতীক বিষয়ে অনেক দূরত্ব সম্বন্ধ। অতএব আমরা যখন পারমার্থিক জগতে বিচরণ করিব, কিম্বা আধ্যাত্মিক কার্য্য লইয়া আলোচনা করিব; তখন জাগতীক নিয়ম, পদ্ধতি ও প্রণালীতে কার্য্য করিলে কি বুঝিলে চলিবে না। দুই ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের বিচার এক রকম প্রণালীতে হইতে পারে না। যখন যাহা পরীক্ষা করিব কি দেখিব সেই টি লইয়াই থাকিব।

আমাদের মন ও তাহার কার্য্য, উভয় দিকে কথ-

নই ধাবিত বা চালিত হইতে পারে না; ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। মনঃসংযম ব্যতিরেকে কোন উৎকৃষ্ট উদ্দেশ্য কি কার্য্য সুন্দররূপে সম্পন্ন হয় না।

তবে আমরা যাহা সচরাচর সামাজিক নিয়ম দ্বারা করি বা দেখি, তাহাতে কোনটারই সূক্ষ্মতা পাই না; কেবল না করিলে নয়, তাই আন্দোলন করিয়া বেড়াই। বস্তুতঃ যদিও এই আন্দোলনে ধর্ম্মের কোন সৎ অভি-প্রায় সাধিত হয় না বটে; কিন্তু সাধারণ জনের অনেক উপকার দর্শিতে পারে, আমরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিব।

ধর্ম্ম—একটী স্বতন্ত্র পদার্থ, ইহার আবাস ভূমি স্বতন্ত্র, ইতিহাস স্বতন্ত্র, কার্য্য স্বতন্ত্র, ও গতি স্বতন্ত্র। ধার্ম্মিক জীবনের কার্য্য, ভাবুকের কার্য্য, চিন্তাশীল ব্যক্তির কার্য্য; সামান্য সামাজিক কিম্বা জাগতীক কার্য্যের সহিত কোন মিল নাই এবং হইতেও পারে না।

আমি পুর্ব্বেই বলিয়াছি যে অন্তর্জগৎ ও বাহ্য জগৎ

দুই ভিন্ন প্রকৃতির পদার্থ। ইহাদের পরস্পরের কার্য্যও বিপরীত। যে বিষয় বাহ্য জগতে দোষ বলিয়া পরিগণিত, তাহা হয়ত অন্তর্জগতে গুণ। এবং যাহা বাহ্য জগতে যশ, তাহা বোধ হয় অন্তর্জগতে অপযশ। অনেকেরই এমনি ভ্রম আছে এবং তাহাদের বুদ্ধি ও বিবেক শক্তি এতই লঘু যে, তাঁহারা বলেন, মনুষ্য ধার্ম্মিক হইতে ইচ্ছা করিলে, ধর্ম্মের ভেক চাই এবং পশার চাই, কাজে যত হোক আর নাই হোক; (যাহা আজ কাল হইয়াছে) ভিতর যত ভাল-হোক, আর নাই হোক, বাহির টা ঠিক থাকিলেই হইল। তাঁহারা ভিতর দেখেন না, মন দেখেন না এবং অন্তরের সৎকার্য্য কলাপ পরীক্ষা করিতে অক্ষম ও অন্ধ। তাঁহাদের কেবল বৃথা ও শূন্য আস্ফালন আছে।

তুলসী পিঁদনে হরি মেলে তো,
মেয় পৌঁজে কুঁদা আউর ঝাড়্।
পাথর পুজনে হর মেলে তো,
মেয় পুজে পাহাড়॥

নিত নাহেনে সে, হরি মেলে তো,
জলজন্তু হোই।
ফল মুল খাকে, হরি মেলে তো,
বাদুড় বাঁদরাই ॥

তিরণ্ ভখণকে হরি মেলে তো,
বহুৎ মৃগী অজা।
স্ত্রী ছোড়্কে হরি মেলে তো,
বহুত রহে হেঁয় খোজা
দুদ্ পিকে হরি মেলে তো,
বহুৎ বৎস বালা।
মিরা কহে বিনা—প্রেম সে,
না মিলে—নন্দলালা ॥

আধ্যাত্মিক প্রেম ও রহস্য—প্রেমিক, ভাবুক ও রসিক জীবনেতেই—নিহিত আছে; এবং তাঁহারাই জানেন, ও ভোগ করেন। সাধারণ লোক তাহা কি জানিবে। অমৃত—সাধারণের জন্য সৃজিত হয় নাই, কারণ তাঁহাদের তপস্যার বল নাই ও ভাব গ্রহণের

[illegible]তা নাই। গুণগ্রাহী ব্যতিরেকে গুণী, বন্ধু, কোন জ্ঞান[illegible]কে বুঝিবে?

"সুধা যে কেমন, সুধা যে কি ধন,
সাধক বিনে কি জানিবে তাহা?"

সংসার প্রায় দ্বেষ ও হিংসায় পরিপূর্ণ, কেহ কাহারও ভাল দেখিতে পারে না এবং দেখিতেও অক্ষম, কারণ এই কলিকালে সাধারণ জীবগণের অন্তঃকরণ এতই সঙ্কুচিত হইয়াছে যে, তাহাদের নিজের নিজের ভাল করা দূরে থাকুক, পরের একটু কোন কিছু দোষ দেখিলেই হাউ মাউ চাউ ও চীৎকার করে। কিন্তু তাহারা এক মুহূর্তের জন্যও ভাবে না যে, তাহাদের নিজের শত ছিদ্র। যথার্থ পক্ষে ভাবিয়া দেখিলে ইহাই বুঝা যায় যে, তাহাদের এ অবস্থায় অন্য কাহারও দোষ গুণ বিচার করিবার কোন ক্ষমতাই নাই।

সমাজের সংস্কার ও বিচার করিবার ক্ষমতা অনেকেরই [illegible] থাকা উচিত, স্বীকার করি, কিন্তু আজকাল

যাঁহারা এই বর্ত্তমান তীর্থ-কালিমা মোচনের উপায় নির্দ্ধারণ করিতেছেন ; তাহা সম্পূর্ণরূপে বিরুদ্ধ-ভাব-বিশিষ্ট,বিবাদ-সূচক ও উপহসনীয়। কারণ নাম কেনাই তাঁহাদের প্রধান ও একমাত্র উদ্দেশ্য। ভক্তি, শ্রদ্ধা, সম্মান, বিশ্বাস, নম্রতা কাহাকে বলে তাহাতে তাঁহারা একেবারেই অজ্ঞ ও বঞ্চিত। আমরা এক্ষণে কোন সংসারত্যাগী যোগী, ঋষি ও সাধুগণকে এই শ্রেণীতে ভুক্ত করিতেছি না ; কারণ তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন বা বলেন তাহা সম্পূর্ণরূপে পবিত্র ও গ্রহণীয়।

ধর্ম্মভাব—সাত্ত্বিক ভাব, অতএব ইহা সাত্ত্বিক ভাবেই বিচার করিতে হইবে। কিন্তু আজ সে বিচার কোথায় ? সে বিশ্বাস কোথায় ? নম্রতা—যে ইহার একটী প্রধান অঙ্গ, তাহা এ দেশ হইতে একবারে পলাইয়া গিয়াছে। ধর্ম্ম সম্বন্ধেই হউক আর তীর্থ সম্বন্ধেই হউক, আজ কালকার আন্দোলন কেবল রাজসিক আন্দোলন মাত্র ; অতএব সাত্ত্বিক ভাবের কোন দোষ দূরীকরণ করিতে হইলে, রাজসিক ভাব

ও আন্দোলনে কি হইবে ? বৃথা আয়াস ও পণ্ডশ্রম মাত্র।

সমাজ সংস্কারকদিগের হৃদয়ে সাত্ত্বিক ভাবের উদয় না হইলে, কখনই নির্ব্বিবাদে ও নিষ্কলঙ্কে এই তীর্থকালিমা মোচনের উপায় হইবে না। রাজসিক উপায়ে কেবল উত্তরোত্তর কলঙ্ক বৃদ্ধি হইবে মাত্র। অতএব মনের মালিন্য দূর করিয়া এরূপ কথা বলা উচিত যে, সেই কথা দ্বারা অন্যের হৃদয় শীতল হয় এবং স্বকীয় হৃদয়ও শীতল করে।

ঐসী বাণী বোলিয়ে,
মনকা আপা খোয়।
ঔরন্ কো শীতল করে,
আপো শীতল হোয়॥

অনেকেই মনে করিতেছেন যে এই প্রকার কাগজে লড়াই করিলেই সমস্ত বিবাদ ভঞ্জন হইবে ও হিন্দু-গৌরব-রবি প্রখরতর হইবে; কিন্তু এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ-রূপে ভ্রমমূলক।

এই প্রকার কাগজে কাগজে আন্দোলনে ও পাঁচ

জনকে বলা কহায়, নিজের সমাজের অমঙ্গল ভিন্ন আর কিছুই লাভ নাই। কেবল লাভের মধ্যে কিঞ্চিৎ দেখা যায় যে দুর্জ্জন ব্যক্তিরা সজ্জনকে দুঃখ দিয়া আপনাদের আশা পূর্ণ করত সুখ লাভ করে।

সজ্জন কোৎ দুখহ দিয়ে,
দুরজন পূরে আশ,
জৈসে চন্দন কোৎ ঘিসে,
সুন্দর দেত সুবাস॥

আর এই প্রকার বাদানুবাদে যে কেবল পুরাতন অমঙ্গল ঘটিবে, তাহা নহে; অধিকতর নূতন বিষময় ফল এই হিন্দু তীর্থ-ক্ষেত্রে ফলিবার সম্ভাবনা আছে।

অতএব হে আর্য্য-সন্তানগণ! তোমরা স্থিরভাবে কার্য্য কর, অত উতলা হইওনা, সৎ ও সাত্বিক কার্য্যে ক্রোধের বশীভূত হইয়া চলিলে, মূলে কুঠার প্রদান করা হয়। যাহার নিমিত্ত বিবাদ করিতেছ, তাহাই যদি নষ্ট হইল তবে বিবাদে ফল কি? ক্ষমা, নম্রতা ও আত্ম-বিসর্জ্জন—ব্যতিরেকে কখন দেশের কিম্বা সমাজের মঙ্গল সাধিত হইতে পারেনা। যদি যথার্থই

সমাজের গৌরব রক্ষা করিতে চাহ, স্বার্থ ও অভিমান পরিত্যাগ কর। যদি আজ ইহা তীর্থ-বিবাদ না হইত তাহা হইলে তোমরা যা বলিতে বা যা করিতে মানাইয়া যাইত, কিন্তু তাহা নহে ; আমাদের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল ও সুখ—হৃদয়ের ধন, প্রাণের ধন—ধর্ম্ম—যাহা আমাদের স্থূল দেহের নিধনেও বিনাশ প্রাপ্ত হয় না।

তীর্থস্থানে অনেক অন্যাযাচরণ, উপদ্রব ও অত্যাচার আছে স্বীকার করি, কিন্তু তাহা বহুকালাবধি চলিয়া আসিতেছে, কেহ কখন তাহার নিবারণের উপায় করিতে পারেন নাই ; তবে যে সেটা ভাল বলিব তাহা নহে, এবং তাহার যে সংশোধন করা উচিত নয়, ইহাও কেহই বলিবেন না। এ কার্য্য সর্ব্বতোভাবে বিধেয় ও পরামর্শ-সিদ্ধ, কিন্তু তাহা কোন্ কোন্ সৎ ও সহজ উপায়ে শোধিত হইবে, অগ্রে তাহা দেখা উচিত। যখন জগদীশ্বর আমাদিগকে বুদ্ধি-বৃত্তি ও বিবেচনা-শক্তি প্রদান করিয়াছেন, তখন এই দুই বৃত্তির সাহায্যে ও সৎপরামর্শে কার্য্যে ব্রতী হইব। মানের কান্না

কাঁদিলে—মান রক্ষা হয় না, অভিমান থাকিলে—আশা পূর্ণ হয়না, অহঙ্কার সত্ত্বে প্রকৃত বন্ধুত্ব—লাভ হয় না। স্বার্থ থাকিলে পরোপকার—করা হয় না, মোহ, হিংসা, দ্বেষ, মাৎসর্য্য ও ক্রূরতা থাকিতে—একতা লাভ হইতে পারে না।

অতএব হে সমাজ-সংস্কারক মহাশয়গণ! আপনারা যখন আসরে নামিয়াছেন, অকিঞ্চিৎকর পার্থিব যশ, নাম ও বাহাদুরীর আশা একবারে ত্যাগ করুন। সরলভাবে ও প্রশস্ত-হৃদয়ে আসুন, আমরা সকলে তাঁহাকে সৎভাবে আলিঙ্গন করি, এবং অন্তঃকরণের সমস্ত মলিনত্ব দূর করি। আমাদের অন্তঃকরণ একটী উদ্যানস্বরূপ, অসৎ প্রবৃত্তিসকল ইহার আগাছা, ইহাদিগকে শীঘ্র শীঘ্র স্থানান্তরিত না করিলে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া সৎপ্রবৃত্তি সকলকে নষ্ট করিবার উপক্রম করে। অতএব আমাদের এই সমস্ত কু-প্রবৃত্তিকে সমূলে উৎপাটন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এবং ইহাদের বিনাশ হইলেই স্বতঃ সাধু প্রবৃত্তিসকল বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে এবং তাহা হইলেই উক্ত প্রণা-

নীতে আমাদের হিন্দু-সমাজের মহৎ ও প্রার্থনীয় উদ্দেশ্য-স্বরূপ সৎবৃক্ষ সকল ক্রমে ভক্তিরসে পরিবর্দ্ধিত হইয়া পুষ্পিত ও ফলবতী হইবে; তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

মাননীয় শ্রদ্ধাস্পদ সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু।

মহাশয়!

তারকেশ্বরের মোহান্ত মহারাজের সম্বন্ধে আজ কাল আমাদের এই হিন্দুসমাজে বড়ই একটা বিপ্লব উপস্থিত। কিন্তু তাহা কতদূর সঙ্গত বা অসঙ্গত প্রমাণ করিবার জন্য, আপনার এই গুণগ্রাহী ও প্রসংশিত পত্রিকায় কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিতে ইচ্ছা করি; মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক সাধারণের ঔৎসুক্য চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত আপনার সংবাপত্রে প্রকাশ করিবেন।

জীবমাত্রেরই দোষ ও গুণ আছে, পার্থিব প্রত্যেক পদার্থ দোষ ও গুণে জড়িত। সৃষ্টির রহস্যই এই।

এমন যে সুন্দর গোলাপ পুষ্প তাহাও কণ্টকবিহীন নহে।

কোন ব্যক্তি একবার দোষী হইয়াছিল বলিয়া যে চিরকালই হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। বরং মনুষ্য ঠেকিলে ক্রমশঃ ভালই হয়। অদৃষ্টে দুর্নাম ছিল বলিয়াই লোকে দিন দিন মজা পাইয়াছে।

মোহান্ত, যে আদালতে প্রথমতঃ পূর্ব্বে একবার দোষী হইয়াছিলেন, সেইখানেই এক্ষণে তিনি নির্দ্দোষী হইলেন। অতএব যখন দেশের আইনানুসারে কোন ব্যক্তির যথার্থ দোষ বা নির্দ্দোষ প্রমাণ হইয়া আসিতেছে, তখন তাহাই গ্রাহ্য করিয়া লইতে হইবে। মিছামিছি চীৎকার করিলে কি হইবে, প্রমাণ দেখাও, ভাল রকম জান, স্থির হও। কেবল লোকের ছিদ্র অনুসন্ধান করা সৎ লোকের কার্য্য নহে। বিশেষতঃ সংবাদদাতাদিগের এ প্রকার উদ্ধতস্বভাবও তিলকে তাল করা কোন মতেই উচিত নয়। ইহা দ্বারা দেশের অমঙ্গল ব্যতীত আর কিছুই উৎপন্ন হয় না।

বিজাতীয়েরা হিন্দুসমাজকে একেই তো দুর্ব্বল

জ্ঞান করে, এবং যদ্যপি এই প্রকার মিছামিছি গণ্ড গোল ও ঘরাও হিন্দু বিবাদ ক্রমাগত চলিতে থাকে, তাহা হইলে অন্য জাতীয়ের নিকট ও অন্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নিকট হাস্যাস্পদ হওয়া ভিন্ন আর কিছুই লাভ নাই।

একেইতো পাদ্রী মহাশয়েরা হিন্দু সমাজের মধ্যে একটু কোন কিছু সূত্র পাইলেই কাগড়াইয়া বসেন, এবং তাহার বিচার আরম্ভ হয়। এর মধ্যেই দুই একখানা ইংরাজী মিশনরী কাগজে হিন্দু "সমাজকে" এবিষয়ে নিন্দা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে,দেশের কুপ্রথাতেই এই সকল কলঙ্কের ঢেউ, সত্যই হউক মিথ্যাই হউক, বার বার উত্থিত হইতেছে। ঘরাও ছেলেমানষি বিবাদে কেবল শত্রু হাঁসে এবং কোন ফলোদয় হয় না। যদি কেহ বলেন বিবাদ কি? বিবাদ এই যে ক্রমানুয়ে এক বিষয় লইয়া একটা দলের লোকের বিরুদ্ধে দোষারোপ করা এবং তাহাদিগকে ঐ বিবাদে উত্তমরূপে প্রবৃত্ত করা। যদি যথার্থই পত্র লেখকগণের অন্তরে ৺ তারকেশ্বর সংক্রান্ত বিষয় বড়ই বাজিয়া থাকে এবং অসহ্য

বলিয়া বোধ হয়, তাঁহাদের এ প্রকার শুদ্ধ কাগজে কলহ করা উচিত নহে।

বিশেষতঃ মোহান্ত মহারাজের বিষয় লইয়া বঙ্গবাসী বড়ই ব্যস্ত, যেন তাঁহারই সমস্ত ব্যথা। হইতে পারে, তবে ব্যথার ঠিক কারণ জানা চাই। এবং ঠিক ব্যথা কি না। তাহা হইলেই ব্যথা দূর হইবার সম্ভাবনা। আমরা দেখিতেছি তাঁহার এতটা গায়ের জ্বালার বিশেষ কোন কারণ নাই। প্রকৃত পক্ষে যদিই তাঁহাদের সমাজসংস্কারের ইচ্ছা থাকে, তবে স্থিরভাবে যথার্থ সাধু ও পণ্ডিতগণের ন্যায় অপক্ষতাভাবে কিসে শান্তি বিরাজিত হয়, তাহাই করা বিধেয়। নতুবা এপ্রকার কাগজে ছড়া কাটাকাটিতে কোন সৎউদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে না। বরং উত্তরোত্তর বিষময় ফল ফলিবে তাহার সন্দেহ নাই। শুদ্ধ যে সমাজ সংস্কারের পক্ষে প্রতিবন্ধক হইবে তাহা নহে, অন্য প্রকার অমঙ্গল ঘটিবারও সম্ভাবনা।"

বঙ্গবাসী সর্ব্বদা বলেন যে, শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মোহান্তের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন

বলিয়া, মোহান্ত মহাশয় তাঁহাকে তহশীলদারি কার্য্য হইতে ছাড়াইয়া দিয়াছেন ; ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও অমূলক। কারণ, তিনি কিম্বা তাঁহার কোন পূর্ব্বপুরুষ কথনও মোহান্তরাজের অধীনে কোন কাজ করেন নাই। তিনি যে কোন কার্য্য সেখানে করিতেন না, তাহা অনেকেই স্পষ্ট প্রমাণ দিতে প্রস্তুত, শুনিলাম। যাহা সত্য তাহা চিরকালই সত্যই থাকিবে, তাহার সন্দেহ নাই।

এবার আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি ও তত্রত্য সম্ভ্রান্ত-লোকদিগের প্রমুখাৎ শুনিতেছি যে, মোহান্ত মহারাজ এই বর্ত্তমান উৎপাতে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী। আরো উচ্চ আদালতে তাঁহার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ হওয়ায় আমাদের উক্ত বিশ্বাস দৃঢ়ীকৃত হইল। বোধ হয় অনেকেরই স্মরণ থাকিতে পারে যে, কিছুদিন পূর্ব্বে এই প্রকার দুই একটী মোকদ্দমা মোহান্তের বিপক্ষে, শ্রীরামপুরের জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রার রিচিসাহেবের নিকট রুজু হয় ; এবং তাহাতে তাঁহার বিপক্ষ দলের হার হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা যে তাঁহার চরিত্রের উপর মিথ্যা অপবাদ

দিয়াছিলেন, তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে। ছিদ্র অনু-সন্ধানকারিগণ অনুগ্রহ করিয়া কিঞ্চিৎ পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিলেই উক্ত বিচারের রায় ও নিষ্পত্তি পাইতে ও দেখিতে পারিবেন। আমার বিশ্বাস যে, সাধারণ লোকদিগের অপেক্ষা কোন মোকদ্দমা সম্বন্ধে আদালতের লোকেরাই প্রকৃত প্রমাণ ইত্যাদি পাইয়া থাকেন, এবং যদিও তাহা অনেকের অপ্রকৃত বলিয়া বোধ হয়, আমরা প্রকৃত বলিয়া ধরিব। কারণ আমা-দের ইহা অপেক্ষা অধিকতর সূক্ষ্মতা জানিবার সম্ভাবনা নাই; ও যদিও থাকে, তাহা "মনুষ্য"হৃদয়ে ইষ্টমন্ত্রের ন্যায় যত্নে রক্ষিত, প্রকাশ হয় না। কাজে কাজেই তাহা অবগত হইবার পক্ষে অতি দূরতর ও অসম্ভব। যাহা আমরা বাহ্য জগতে দেখিতে ও শুনিতে পাই, তদনুসারেই আপাততঃ কার্য্য করিব।

জগতে বহুসংখ্যক কুপ্রবৃত্তির লোক আছে, তাহারা কেবল সতত এখানে সেখানে, নানা প্রকার লোভের বশীভূত হইয়া, মনুষ্যের দোষ ও নিন্দা অনুসন্ধান করিয়া বেড়ায় এবং তাহাতেই বড় সুখ অনুভব করে

ও মজা পায়। যে, যে প্রকৃতির লোক, তাহার পক্ষে তাহা হইলেই উত্তম ও আনন্দদায়ক হয়। শুনিলাম মোহান্ত মহারাজের অধীনস্থ ও চতুষ্পার্শ্বস্থ অনেক নীচপ্রবৃত্তি ও অর্থলোভী ব্যক্তির সমাগম আছে; এবং তাহাদের দ্বারাই নানা প্রকার কৌশলে, এই সকল উৎপাতের সৃষ্টি। আমরা পরম্পরায় শুনিতে পাই যে (তাঁহার একবার কুগ্রহ কর্ত্তৃক অদৃষ্টে বিপদ ও লাঞ্ছনা ঘটিয়াছিল বলিয়া) মধ্যে মধ্যে তাঁহার দুই চারিজন ভদ্র কর্ম্মচারী ব্যতীত, অধিকাংশ লোকেই অর্থ লাভ করিবার জন্য, মোহান্ত মহারাজের নামে অপবাদ রটনা করিয়া মোহান্ত মহারাজকে অর্থব্যয় করাইয়া থাকে।

পৃথিবীতে সৎলোকের সংখ্যা অতি বিরল, অতএব কোন বিষয় ন্যায়ই হউক বা অন্যায়ই হউক, সাধারণের মুখে শুনিয়া বিশ্বাস করা কোন ক্রমেই পরামর্শসিদ্ধ নহে। জনশ্রুতিতে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কখনই মনঃসংযোগ করেন না। লোকে এক হয় তো আর করে; প্রকৃত বিষয় জানিতে ও তাহার দোষগুণ বিচার করিতে জগতে কয়জন আছে?

আমাদের এ বিষয়ে বিশেষ কোন স্বার্থ বা অভিসন্ধি নাই। স্বার্থের মধ্যে এই যে, সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের গৌরব ও শান্তি রক্ষা করাই উদ্দেশ্য।

এক্ষণে শ্রীশ্রী৺ তারকেশ্বরের নিকট আমাদের এই প্রার্থনা যেন তথাকার ও হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান সমস্ত "আপদ" দূর হইয়া যায়, এবং ক্রমে ক্রমে পবিত্রতা ও উন্নতির রেখা উত্তোলমান হয়।

শাস্ত্র ক, প, ম।

THE MOHUNT OF TARKESWAR

TO THE EDITOR OF THE "INDIAN MIRROR."

Audi alteram partem.

SIR,—From the paragraph in your to-day's paper regarding the Mohunt, I take the liberty to quote the following to review and to contradict, which I am confident, you will allow :—" * * * But the Mohunt of Tarkeswar cannot deny his *antecedents.* We must say that his continuance as the high priest of the temple of Tarkeswar is neither honorable to the Hindu community nor consistent with the spirit of the Hindu religion."

Your remark is very wise, and at the same time admissible. But one thing I have been verysincerely longing to learn from the refor-

mers of Hindu religion, and that is why and with what authority has his *continuance*, as the high priest of the temple, been so long tolerated by the Hindu community, considering his former single misconduct (antecedent) not plural, as you write? is not such toleration consistent with the spirit of the Hindu religion? If not, what was it, where was the Hindu community then? Had the people no voice, or were they all powerless? I am very sorry to say that your comment now upon that lost subject is too late and spiritless. Our principle should be "let the dead past bury its dead."

Besides, every one must admit that repentance is the atonement of sin; so when an individual becomes penitent, he gets rid of sin, and hence arrives at the original condition of *humanity*. I would have termed here holiness or purity, but, I am affraid it is

quite fallacious and impossible to expect this perfection in a corporeal existence. To err is human. Numerous people are solely engaged, without thinking whether it is right and wrong, to find fault with the character of the Mohunt, for the purpose merely of molesting and attacking him. But "let him, who is without sin, cast the first stone." It is very difficult to understand the subjective state of human nature, which is so intricate and puzzling.

Now my present controversy regarding the current disputes and the allegations of misconduct, brought against the Mohunt by the *Bangbasi* and other papers, which have been clearly shown in his support in my recent letter to the *Someprokash*, is simply to bring peace and glory to the Hindu community.

But if necessarily I sit down, and require

to examine and criticise the Mohunt's by-gone errors, though I am not in a position to do so now, without having the proper materials after a lapse of time, I might boldly assert, according to Solomon, that "all things arise from women." The woman is at the bottom of each evil, not the man.

'Men some to business and some to pleasure take."

But every woman is at heart a rake."

Hence it is inferred that even the origin of each evil, in fact, lies not in man. Only for the sake of doing honor to the character of the weaker, sexes, all the responsibilities men take upon themselves in the shape of public disgrace, dishonor and trouble.

Now it remains for me to say, and every religionist knows and will confess that, according to the highest doctrines of the Aryan *Shastras*, even the many sages and *rishis*, in

spite of their weak points and blemishes, which are classed as metaphysical puzzles, have been highly admired and worshipped by their followers. Why is this? Because there is some thing very great aud divine in them locked in mystery, which we do not comprehend.

One might well say that the Mohunt can never be placed side by side with these devines. That is very true, but he has every right, as a high priest, to claim even a lower position among them which none can gain-say. Consequently we should make this as a postulate, and follow and act with a firm faith and belief. I am a Hindu, and I am always in favor of peace, love and joy.

Yours, &c.,

PUNDIT K. P. M.

The 14th July, 1889.

The Importance of Reverence.

The term reverence means to show regard and respect as well as affection, towards our fellow creatures, either superior or inferior ; sincerely and in every way.

In truth, to enter with understanding into the spirit of reverence, it is necessary for us to be equipped with a profound and honest love for humiliation. Much of our present grievance, distress and all sorts of confusions, relating both—to temporal and —spiritual matters, depend entirely on want of true appreciation of the value of honor and veneration.

The world of today is mostly shallow, and deals with things superficial. The

proper exhibition of reverence among any nation or society keeps our—subjective state of atmosphere in a perfect peace and order. All our aims and aspirations would never be completed, if we do not follow the path of adoration cautiously and prudently. Wealth, learning and reputation has no force whatever, unless strengthened by the power of respect. The person, who lacks this noble capacity, can claim no superiority or attention over his people. The chief opponents to the duties and action of reverence, are self-sufficiency, and insolence.

The only test of real progress, is to be found in the development of character; the chief element of which is reverence. Institutions, societies, laws count for nothing unless they tend to make people srtonger to choose the good and refuse the evil.

Rightly used the power might give to many who are weak a new strength, vigour and force of character. We all look for a time, when there shall be no more hunger nor thirst, when love will share the strength of the few among the many, and when God shall take away tears from every eye, or, putting the same end in other words, we all look for a time when the conditions of existence shall be such that it will be possible for every man and woman not only to live a decent human life, but also to enjoy the fulness of life which springs from friendship and from knowledge.

Better, therefore, is it slowly to educate the emotions and the reason of the people, than by a sudden pull on their emotions to get them to agree to a law which will for a long time lie dormant. Better, is it that men should learn intelligently their own way

through life. than under even a great mans' umbrella, lose both knowledge of thier way, and confidence in themselves. Further, the other defence which I think that all would be wise to remember is that the only test of progress is in the development of character.

THE END.